

জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও প্রযুক্তি শিক্ষা

শিক্ষা ব্যবস্থা

মো. সিরাজুল ইসলাম

জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন তথা অর্থনীতি এই সময়ের একটি আলোচিত বিষয়। আভিধানিক অর্থে 'জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি' বা কে-ইকোনমির (নলেজ ইকোনমি) সংজ্ঞা মোটামুটি এরকম যে অর্থনীতিতে কায়িক বা শারীরিক পরিশ্রমের চেয়ে মেধা বা জ্ঞানের ব্যবহার বেশি হয়ে থাকে। অর্থাৎ, কৃষি ও শ্রমিকনির্ভর অর্থনীতি বা পি-ইকোনমি (প্রোডাকশন ইকোনমি) এর ঠিক উল্টোটা। যেমন: একজন প্রকৌশলী যখন বিমান বা কম্পিউটার বানাচ্ছেন, উঁচু দালান কিংবা সেতুর নকশা করছেন কিংবা সফটওয়্যার তৈরি করছেন। জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি অনেক বেশি সম্ভব। যেমন, আপনি যে বিমানটি ১০০ কোটি টাকায় কিনেছেন, এর যে কাঁচামাল যথা লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম—এ সবকিছুর বাজারমূল্য হয়তো ১০ কোটি টাকা। আর তাহলে মেধার মূল্য বাকি ৯০ কোটি টাকা। অন্যদিকে, পোশাকশিল্পে ১০ কোটি টাকার কাঁচামাল, যেমন সুতা থেকে কাপড় এবং টি-শার্ট তৈরি করে আপনি বড়জোর ২০ কোটি টাকা আয় করতে পারেন। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে আপনার কাজের দ্বারা পণ্যটিতে 'ভ্যালু অ্যাডিশন'-এর পরিমাণের ক্ষেত্রে এ দুটি শিল্পের বিস্তর ফারাক।

এটা বলা বাহুল্য যে একবিংশ শতাব্দীর এই পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে বিশ্বদরবারে দাঁড়াতে চাইলে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন তথা অর্থনীতির কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল দেশের জন্য এটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, জ্ঞানের ভিত্তিতে কেবল এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে একটি উৎপাদনশীল জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। ২০১৪ সালের একেবারে শেষের দিকে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত 'জ্ঞানভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন' সূচকে এশিয়ার দেশগুলোর অবস্থানবিষয়ক এক

জরিপে দেখা যায় যে এশিয়ার জরিপকৃত ২৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ২৭তম (১.৪৯)। অর্থাৎ তালিকার দ্বিতীয় সর্বনিম্ন। আমাদের নিচে শুধু মিয়ানমার (০.৯৬)। এ ছাড়া আলাদাভাবে তিনটি সহসূচক যথা: উদ্ভাবন, শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোতে বাংলাদেশের অবস্থান যথাক্রমে ২৬, ২৫ ও ২৪তম। মূলত, জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির জন্য অন্যতম যে চারটি মূল উপাদান অর্থাৎ শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবন, তথ্যপ্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা—এর প্রায় সব কটিতেই বাংলাদেশের অবস্থান আশাব্যঞ্জক নয়।

উল্লেখ্য, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের এই তালিকায় এশিয়ার প্রথম দুটি দেশ ছিল জাপান (৮.৭৭) ও সিঙ্গাপুর (৮.৫২)। আমার সৌভাগ্য যে উচ্চশিক্ষার্থে এ দুটি দেশেই গমন এবং লম্বা সময় অবস্থানের সুযোগ আমার হয়েছিল। কোনো প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়াই জাপানের পক্ষে বিশ্বের সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হওয়ার পেছনে অন্যতম চালিকাশক্তি হচ্ছে এর দক্ষ জনশক্তি আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে চরম উৎকর্ষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া দেশটি কঠোর পরিশ্রম, সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার আর সর্বোচ্চ কারিগরি দক্ষতার বদৌলতে আজ উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হতে পেরেছে। দেশটিতে প্রাকৃতিক সম্পদ প্রায় নেই বললেই চলে। উল্লেখ্য, জাপানের মোট জনসংখ্যা বাংলাদেশের প্রায় সমান এবং সমতলভূমি বিবেচনায় জনসংখ্যার ঘনত্বও প্রায় সমান।

সবকিছুতে প্রায় মিল থাকার পরও দেশ দুটির অর্থনীতির বিস্তর ফারাকের কারণ 'মানুষ'-এর যোগ্যতার হেরফের—তার জ্ঞান, শিক্ষা, সময়ানুবর্তিতা ও কর্মদক্ষতার বিস্তর পার্থক্য।

একইভাবে বাংলাদেশের প্রায় সমান সময়ে, অর্থাৎ ১৯৬৫ সালে স্বাধীন হয়েও সিঙ্গাপুর ইতিমধ্যে বিশ্বের একটি অন্যতম ধনী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। দেশটি যখন মালয়েশিয়া থেকে স্বাধীনতা লাভ করে, তখন এটি একটি জেলেপন্থির মতোই ছিল। দেশটির এই আজকের অবস্থানে আসার পেছনে যে কারণগুলো কাজ করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শিক্ষার বিস্তার এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে চরম উৎকর্ষ সাধন। সিঙ্গাপুরের প্রতিষ্ঠাতা প্রধানমন্ত্রী লি কিউআন তাঁর প্রায় ৩০ বছরের শাসনামলে যে বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, তা হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদহীন সিঙ্গাপুরের প্রতিটি নাগরিককে সম্পদে পরিণত করা। প্রাথমিক থেকে গুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব পর্যায়ে সর্বোচ্চ মানের শিক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে তিনি এটি সম্ভব করেছিলেন।

এদিক থেকে বাংলাদেশের চিত্রটি সত্যিকার অর্থেই অত্যন্ত করুণ। স্বাধীনতার প্রায় ৪৩ বছর অতিক্রমের পরেও এখনো আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক নয়। দেশের মোট আয়ের একটি বড় অংশ আসে পোশাকশিল্প আর প্রবাসীদের পাঠানো টাকা থেকে। উভয় ক্ষেত্রে মূলত বাংলাদেশিরা শ্রমিক পর্যায়ে কাজে নিযুক্ত। অর্থাৎ দেশের জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ অদক্ষ। আর এ জন্য এখন পর্যন্ত আমরা জনসংখ্যাকে একটি বোঝা

হিসেবেই গণ্য করছি। এটা ঠিক যে শিক্ষার বাজেট বছর বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষার গুণগত মান, প্রায়োগিক শিক্ষার প্রসার ইত্যাদির ব্যাপারে আরও জোর দেওয়া উচিত ছিল। বিশেষ করে, বিজ্ঞান ও কম্পিউটার শিক্ষাকে আরও যুগোপযোগী ও জনপ্রিয় করে তোলার উদ্যোগ তেমন লক্ষণীয় নয়। গত কয়েক দশকে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমে গেছে আশঙ্কাজনক হারে, প্রায় ৩০ শতাংশ। তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার, যা কিনা জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার একটি অন্যতম নিয়ামক, শিক্ষার সর্বস্তরে এর ব্যাপক বিস্তারেরও প্রয়োজন ছিল। স্কুলপর্যায়ে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও তাতে আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হয়নি। আসলে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার উন্নতি করা না গেলে কখনোই দক্ষ জনশক্তি আশা করা যায় না।

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতও যেখানে তথ্যপ্রযুক্তিতে ব্যাপক উন্নতির মাধ্যমে ডিজিটাল বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়েছে, আমাদের অবস্থান এ ক্ষেত্রে সত্যি হতাশাজনক। তবে সাম্প্রতিক সময়ে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের সরকারের কিছু উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। যেমন ইউনিয়ন তথ্যসেবাকেদ্র স্থাপনের মাধ্যমে ইন্টারনেটকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। একইভাবে মোবাইলে প্রি-জি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ইন্টারনেট-সেবাকে সহজলভ্য করা হয়েছে। তবে তথ্যপ্রযুক্তিকে একটি শিল্পে রূপান্তরিত করার জন্য উদ্যোগের যথেষ্ট অভাব রয়েছে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর যে স্বপ্ন বর্তমান সরকার দেশবাসীকে দেখিয়েছে, তা আসলে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনেরই রূপকল্প। আর এ ক্ষেত্রে সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সরকার তা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে দেশকে দ্রুতগতিতে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

● মো. সিরাজুল ইসলাম: অধ্যাপক ও ডিন, স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ফিজিক্যাল সায়েন্সেস, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতও যেখানে তথ্যপ্রযুক্তিতে ব্যাপক উন্নতির মাধ্যমে ডিজিটাল বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়েছে, আমাদের অবস্থান এ ক্ষেত্রে সত্যি হতাশাজনক